পরমাণু সন্ত্রাস

সুজয় বসু

২০০৬-এর ২৩ নভেম্বর প্রাক্তন সোভিয়েত কেজিবি-র এক গুপ্তচর, আলেকজান্ডার লিৎভিনেন্‌কো, ইংল্যান্ডের এক হাসপাতালে এক রহস্যজনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ৪৩ বৎসর বয়স্ক সুদেহী আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয় রোগাক্রান্ত হবার অল্প ক'দিনের মধ্যেই। এত দ্রুত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় যে, প্রায় কোনো চিকিৎসাই তিনি নিতে পারেন নি। লন্ডনের এক পানশালায় তাঁর পুরোনো রুশ বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটানোর পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কট্টর পুতিন-সমালোচক আলেকজান্ডার এর কিছুদিন আগে দেশত্যাগ করে লন্ডনেই বসবাস করছিলেন। তাঁর মৃত্যু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় তদন্ত শুরু হয় এবং জানা যায় যে তাঁর পানীয়তে বিষ মিশিয়েই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেই বিষ তেজস্ক্রিয় 'পোলোনিয়াম-২১০'। ওই পানশালায় তেজস্ক্রিয়তার রেশ পাওয়া গিয়েছে। প্লুটোনিয়ামের সগোত্র এই পেলোনিয়াম মৌল পরমাণু চুল্লির জ্বালানি থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা যায়। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তথ্য অনুসন্ধানে নেমে আবিষ্কার করেছেন যে, ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের মস্কো-লন্ডন উড়ানের ছ'টি বিমানে এখনও তেজস্ক্রিয়তা— কম পরিমাণে হলেও রয়েছে। যে ৩০,০০০ যাত্রী এই সব বিমানে যাতায়াত করেছেন তাঁরা এক গভীর আশংকায় ভুগছেন— তেজস্ক্রিয়তা তাঁদের কতটা ক্ষতি করেছে বা করতে পারে তার সম্ভাবনায়।

পানীয়ের সঙ্গে মেশানো বিষ বেশি পরিমাণে নিশ্চয়ই ছিল না এবং এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ওই বিষ ছিল স্বাদ-গন্ধহীন। সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল নিরীহ যাত্রীদের এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে, তা থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পড়লে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো কতটা বিপর্যয় সৃষ্টি কতে পারে।

পরমাণু অস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতার প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই আমেরিকার নিউ মেক্সিকো রাজ্যের এক জনহীন প্রান্তরে। জনপদের উপর এই বিস্ফোরণ কতটা মারাত্মক হতে পারে হিরোশিমা-নাগাসাকি তার সাক্ষ্য। একটা অসামরিক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে গোলযোগ ঘটলে কী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে রাশিয়ার চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দুর্ঘটনা থেকে তা জানা গেছে। অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে শারীরিক ক্ষতি কতটা হয় বিভিন্ন দেশের সমীক্ষা, গবেষণা ও অগুন্তি ঘটনা থেকে তারও আন্দাজ করা যায়। শত্রুর বড়ো রকমের ক্ষয়ক্ষতি করতে গেলে পরমাণুর জুড়ি নেই। আমেরিকার ৯/১১-র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এর যমজ ধ্বংস করে সন্ত্রাসবাদীরা দেখিয়েছে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে সামান্য কয়েকজন কত নতুন কৌশলে জীবন ও সম্পদের কি অভূতপূর্ব ধ্বংসসাধন করতে পারে। ভাগ্য ভালো যে, পরমাণু এখনও অবধি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু হবে না একথা নিশ্চয় করে কেউই বলতে পারছেন না।

প্রধানত তিন ভাবে সন্ত্রাসবাদীরা পরমাণুকে ব্যবহার করতে পারে। প্রথমত, গোপনে পরমাণু বোমা তৈরি করে সরাসরি জনবহুল অঞ্চলে তার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে; দ্বিতীয়ত, কোনো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে, বাইরে থেকে আঘাত করে বা ভিতরে ঢুকে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদিকে বিকল করে দিয়ে; তৃতীয়ত, সাধারণ বিস্ফোরকের চারদিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঠেসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দিয়ে— যার নামকরণ হয়েছে Dirty Bomb বা 'নোংরা বোমা'। এই তিন পদ্ধতির প্রয়োগে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ছাড়াও যে আতঙ্ক ছড়াবে তা নিশ্চিতই জনজীবনকে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত করে তুলবে। সন্ত্রাসবাদীরা তাই-ই চায়। সহজে করা না গেলেও পরমাণুর এই বিপজ্জনক ব্যবহার খুব কঠিন নয়, অসম্ভব তো নয়ই। সতর্কতা বাড়ছে, ব্যবস্থাদিও নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্যুতিহীন ব্যবস্থাদি নিয়ে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবেই এ কথা কোনো দেশই জোর করে বলতে পারছে না।

পরমাণু বোমা তৈরি হয়েছিল প্রচুর অর্থ ও মেধার ব্যয়ে। পশ্চিমী দুনিয়ার প্রথম শ্রেণির বিজ্ঞানী ও কারিগররা প্রায় বন্দিদশায় থেকে উদয়াস্ত খেটে বোমা তৈরিতে সক্ষম হন। অসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। আমেরিকায় এক সময়ে সওয়া লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন মাত্র জানতেন এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্যটা কী। ১৯৪৫ সালে আমেরিকা পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণটি করে। তখন তাদের ধারণা ছিল, অন্য কোনো দেশ সহজে এটা তৈরি করে উঠতে পারবে না। তারাই একমাত্র

□□ ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন-এর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল লেবেদ আমেরিকার কংগ্রেস সদস্যদের এক প্রতিনিধিকে কথায় কথায় বলে ফেলেন যে, সোভিয়েতরা এক কিলোটনের বিস্ফোরণ ক্ষমতার যত সুটকেস বোমা বানিয়েছিল তার মধ্যে ৮৪টার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। ... সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হতে পারে, কোথাও সাবধানে রাখা থাকতে পারে অথবা চুরি কিংবা বিক্রিও হয়ে যেতে পারে। ... ওই সুটকেস বোমা হাতে করে নিয়ে যে কেউ মস্কো বা নিউইয়র্কের রাস্তায় হেঁটে যেতে পারে এবং বিশ-ত্রিশ মিনিট সময় পেলেই বোমাটা ফাটানো যায়।

পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র হিসাবে সকলকে ভয় দেখিয়ে চলবে। মাত্র চার বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এই ভুল ভেঙে দেয়। দুই শিবির পরমাণু অস্ত্র-দৌড় শুরু করে। হাজার হাজার বোমা তৈরি হয়। প্রথম দিককার গোপনীয়তা বজায় রাখাও দীর্ঘকাল সম্ভব হয় না। অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতির নানা তথ্য গুপ্তচর মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের হাতে আসে। ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় অস্ত্র সম্পর্কে প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হতে শুরু করে। বর্তমানে প্রায় অনায়াসেই এই সব তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং মোটামুটি দক্ষতা নিয়েই কয়েকজন মিলে একটা স্থূল পরমাণু বোমা বানিয়ে ফেলতে পারে। সন্ত্রাসবাদীদের অনেক দলই যে বোমা বানাতে সক্ষম, সরকারি মহলও তা স্বীকার করেছে। তারা করতে পারছে না একটাই কারণে। বোমা তৈরির মূল উপাদান 'অতি সমৃদ্ধ' (highly enriched) ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়াম তাদের হাতে নেই। কোনোক্রমে পাঁচ-ছয় কিলোগ্রাম সংগ্রহ করতে পারলেই বোমা বানানো যাবে। অতি দুষ্প্রাপ্য এই দ্রব্য দু'টিই সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্রধর হবার পথে একমাত্র অন্তরায়।

কিন্তু পরমাণু অস্ত্রের মূল উপাদান সংগ্রহ করা কি একমুখী কোনো চেষ্টায় সম্ভব নয়? এর উত্তরে 'না' বলাটা ইদানীং সম্ভব হচ্ছে না। সোভিয়েত শিবিরে ধস নামায় সেখানে অস্ত্র প্রকল্পের কাজকর্ম অনেকদিন হলো প্রায় বন্ধ। অস্ত্র বিজ্ঞানীদের অনেকেই অতিশয় দুর্দশার মধ্যে যাচ্ছিলেন; একই ভাবে প্রবল অর্থকষ্টে ভুগছিলেন বহু সাধারণ কর্মীও। যে সব কেন্দ্রে এই উপাদানগুলো তৈরি হতো সেখানে সর্বত্র কড়া পাহারাদারী আগের মতো নেই। এমন ঢিলেঢালা অবস্থা যে আমেরিকার কংগ্রেসের এক সদস্য কিছু কিছু কেন্দ্র পরিদর্শন করে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'আলুও এর থেকে ভালো করে পাহারা দেওয়া হয়'। ফলে বাড়তি আয়ের জন্য— অর্থকষ্ট লাঘব করতে— বেআইনি বিক্রিবাটা চলছে। চোরাচালান বাড়ছে। কিছু ধরা পড়েছে, সবটা হয়তো নয়। একটু একটু করে সংগ্রহ করাই যায়। সুতরাং সন্ত্রাসবাদীরা ধীরে ধীরে নিজেরাও অস্ত্র তৈরি করতে পারবে এমন আশঙ্কা অনেকেই করছেন।

শুধু তাই নয়, গোটা অস্ত্রটাও তাদের হাতে আসতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার অঙ্গরাজ্যগুলো স্বাধীন হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রতিরক্ষার কারণে সোভিয়েত সামরিক বিভাগ ৩০টির মতো জায়গায় পরমাণু অস্ত্র মজুদ রেখেছিল। অঙ্গরাজ্যগুলোর আর প্রতিরক্ষার দায় নেই। অস্ত্রগুলো পড়ে আছে, কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই। আমেরিকার সরকার এতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রাশিয়াকে অস্ত্রগুলো নিজের দেশে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্যে চাপ দেয়। প্রবল অর্থাভাবে দ্রুত এই কাজ করতে রাশিয়া অপারগ হলে আমেরিকা ৩০০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য করতে বাধ্য হয়। সরকারি আইনে এই সাহায্যের কোনো অনুমতি নেই বলে বিভিন্ন ভাবে এই বিপুল অর্থ পাঠিয়ে কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান ও বেলারুশ থেকে কয়েক হাজার পরমাণু অস্ত্র রাশিয়াতে ফেরত আনার ব্যবস্থা হয় মাত্র বছর বারো-চোদ্দো আগে। প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামও ছিল এই ফেরত নিয়ে আসার তালিকায়। কিন্তু সবটাই ঠিক ঠিক মতো এসেছে কি?

এই সম্পর্কে একটা উদ্বেগজনক ঘটনা জানা গেছে। ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন-এর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল লেবেদ আমেরিকার কংগ্রেস সদস্যদের এক প্রতিনিধিদের কথায় কথায় বলে ফেলেন যে, সোভিয়েতরা এক কিলোটনের (হিরোশিমার বোমাটা ছিল ১২ কিলোটনের মতো।) বিস্ফোরণ ক্ষমতার যত সুটকেস বোমা বানিয়েছিল তার মধ্যে ৮৪টার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকায় টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেন যে, শ'আড়াই মতো এই বোমা বানানো হয়েছিল তার মধ্যে শ'খানেকের হিসাব নেই। সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হতে পারে, কোথাও সাবধানে রাখা থাকতে পারে অথবা চুরি কিংবা বিক্রিও হয়ে যেতে পারে। রাশিয়ার সরকার এই বোমার কথাটাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে, এমন বোমা নাকি কখনও ছিল না। জেনারেল লেবেদ এও বলেছিলেন যে ওই সুটকেস বোমা হাতে করে নিয়ে যে কেউ মস্কো বা নিউইয়র্কের রাস্তায় হেঁটে যেতে পারে এবং বিশ-ত্রিশ মিনিট সময় পেলেই বোমাটা ফাটানো যায়।

একটা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লিতে যে জ্বালানি থাকে তার পুরোটাই তেজস্ক্রিয়। নতুন অবস্থায় ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম মিশ্রণ। ইউরেনিয়ামের ভারী পরমাণু-কেন্দ্রিন বিভাজিত হবার ফলেই তাপশক্তি উৎপন্ন হয় যা জলকে বাষ্পে পরিণত করে এবং ওই বাষ্প দিয়ে টারবাইন জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। বিভাজনের ফলে ইউরেনিয়াম অন্যান্য মৌলে যেমন আইওডিন, সিজিয়াম ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং ইউরেনিয়ামের মতো এই ভগ্নাংশগুলোও তেজস্ক্রিয়। অত্যন্ত পুরু বিশেষ ইস্পাতের তৈরি চুল্লির খোল বা মূল আধার তাও ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় হতে থাকে। সুতরাং চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটলে ভিতরের বিভিন্ন ধরণের যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে সেগুলো ছোটো-বড়ো টুকরো বা কণার আকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। খুব ছোটো কণাগুলো বাতাসে দীর্ঘকাল ভাসমান থাকে এবং বাতাসবাহিত হয়ে দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। চেরনোবিল বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় মেঘ আমেরিকা-জাপান অবধি পৌঁছেছিল। তেজস্ক্রিয় মৌল কিছু আছে স্বল্পায়ু আবার কিছু দীর্ঘায়ু— অর্থাৎ 'অর্ধজীবন' বা 'half-life' কম বেশি। ফলে একটা পরমাণু অস্ত্র বিস্ফোরণে তেজস্ক্রিয়তাজনিত যে ক্ষয়ক্ষতি হবে একটা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটলেও অনুরূপ ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতি হবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-বিক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং তার নিয়ন্ত্রণও খুব সূক্ষ্ম। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় গিয়ে বিপর্যয় ঘটাতে সময়ও বেশি লাগে না। এই অস্বাভাবিকতা আনা যায় দু'ভাবে। বাইরে থেকে প্রবল আঘাত হেনে চুল্লির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদিসহ

সবকিছু ভেঙেচুরে ফেলে এবং চুপিসাড়ে বা বলপ্রয়োগ করে ভিতরে ঢুকে সুস্থ নিয়ন্ত্রণকে পরিকল্পনা মাফিক পালটে দিয়ে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ শৈলী যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে সুদৃঢ় ভাবেই করা হয় যাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্ঝা কোনো রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে। চুল্লির জ্বালানির যে মূল আধার তা ১০/১০ সেন্টিমিটার পুরু বিশেষ ধরণের ইস্পাতের তৈরি। এটাকে রাখা হয় একমিটারের মতো চওড়া শক্ত কংক্রিটের দেওয়ালের নিশ্চিদ্র এক প্রকোষ্ঠে। সহজে ফাটবার বা ভাঙবার মতো কখনই নয়। সুতরাং এতদিন ধরে পরমাণু চুল্লির নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু আমেরিকায় ৯/১১-র বিধ্বংসী ঘটনার পর আর নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে না। সেখানকার নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশন-এর এক সদস্য কবুল করেছেন যে, একটা তেল ও যাত্রীভর্তি বোয়িং ৭৬৭ বিমানের সরাসরি আঘাত সইবার মতো ক্ষমতা এখনকার চালু ১০৩টি চুল্লির কোনোটারই নেই। ইতিপূর্বে কেউ ভাবতেও পারেন নি যে, এমন একটা গোটা বিমানকেই বোমার মতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

অবশ্য চুল্লিটাকেই লক্ষ্য না করে চুল্লির পাশের পোড়া জ্বালানিগুলোর গুদাম বা ভাণ্ডারকে তাক করলেও চলে। অনেক সহজেই তা করা যায় কারণ এই ভাণ্ডারগুলো অস্থায়ী বলে খুব একটা শক্তপোক্ত করে তৈরি হয় না। জ্বালানিগুলো চুল্লির ভিতরে থাকে বছর তিনেকের মতো। তার পর আর ততটা কার্যক্ষম থাকে না। অর্থাৎ প্রতি বৎসর প্রত্যেকটা চুল্লি থেকে এক তৃতীয়াংশের মতো জ্বালানি বাইরে বের করে আনতে হয়। তখনও এই জ্বালানিগুলো থাকে তীব্র তেজস্ক্রিয় এবং যথেষ্ট তপ্ত। এগুলোর উপর অবিরত জল ঢেলে ঠান্ডা করতে হয়। বছর কয়েক আগে জাপানের টোকাইমুরা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে সব কর্মীদের ওপর এই জল ঢালবার দায়িত্ব ছিল তাদের অন্যমনস্কায় একটা বড়ো ধরণের আগুন লেগে গিয়েছিল। কিছুটা ঠান্ডা হলে জ্বালানিগুলোকে তুলে এনে একটা বড়ো চৌবাচ্চায় ৫/১০ মিটার জলের নীচে রেখে দেওয়া হয় (Swimming pool storage) বেশ কিছুকাল। যথেষ্ট ঠান্ডা হবার পর সেগুলো তুলে এনে থাক থাক করে সাজিয়ে রাখা হয় যাতে বাতাসেই ঠান্ডা থাকতে পারে (dry storage)। বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় এই পোড়া জ্বালানিগুলোর অন্তিম আশ্রয় হবে স্থায়ী সংরক্ষণাগারে। গ্রানাইট পাহাড়ের মধ্যে ৩০০ মিটার নীচে টানেল খুঁড়ে রাখার চেষ্টা চলছে। যেহেতু এই সংরক্ষণাগারকে অটুট থাকতে বা রাখতে হবে দশ-বিশ হাজার বৎসর (!) এখনও কোনো সন্তোষজেনক সংরক্ষণাগার তৈরি করা যায় নি পৃথিবীর কোনো দেশেই। আমেরিকার নেভাদা অঙ্গরাজ্যে ইউকা পর্বতে একটা সংরক্ষণাগার তৈরির কাজ চলছে বেশ কয়েক বৎসর। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এর দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে, ফলে কাজ চলছে ধীরে। প্রেসিডেন্ট ওবামা এই খাতে বাজেটে কোনো বরাদ্দ অনুমোদন না করায় এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অজানা। যেহেতু পোড়া জ্বালানিগুলোকে স্থায়ী ভাবে কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করা হয়ে উঠছে না, আপাতত এগুলোকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশেই গুদামজাত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি বৎসরই জমতে জমতে এখন এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০,০০০ টনের মতো। অস্থায়ী ভাণ্ডারগুলোতেও স্থান সংকুলান হচ্ছে না এবং সমস্যা বেড়েই চলেছে। যাই হোক যখন এই জ্বালানিগুলো রাখবার ব্যবস্থাদি হয়েছিল তখন আতঙ্কবাদ মাথা চাড়া দেয় নি এবং এই সম্পর্কে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার কথাও কারও মাথায় আসেনি। অবধারিত ভাবেই নিরাপত্তায় প্রবল দুর্বলতা রয়েছে। বড়ো কোনো বিস্ফোরকের ব্যবহারে এই অস্থায়ী জ্বালানি ভাণ্ডারগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এমন কি জ্বালানি ঠান্ডা করবার চৌবাচ্চা থেকে জল (যা অতি তেজস্ক্রিয়) বের করে দিলেই আপনা-আপনি সেখানে একটা বিস্ফোরণ ঘটাও সম্ভব। ওই জলটা ঠিকমতো বের করে দেওয়ার ফলে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তার একটা হিসাব ব্রুকহাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি-র বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন। এতে ক্যানসারে মৃত্যু হতে পারে ২৮,০০০ জনের, সম্পদহানি হবে ৫,৯০০ কোটি ডলারের এবং বসবাসের অনুপযুক্ত হবে ৪৯০ বর্গ কিলোমিটার জমি। সুতরাং মরিয়া কোনো প্রচেষ্টা জ্বালানিস্তূপে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে।

চুপিসাড়ে বা অতর্কিত আক্রমণ করে নিরাপত্তা রক্ষীদের পর্যুদস্ত করে বা তাদের ডিঙিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রর ভিতরে ঢুকে পড়াও খুব কঠিন নয়। ইংল্যান্ডে 'গ্রিনপিস'-এর স্বেচ্ছাসেবীরা এইজাতীয় কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে এমন ছদ্ম আক্রমণে সফল হয়েছিল। এই ঘটনা খুব বেশিদিনের কথা নয়। নিশ্চয়ই তার পর আরও কঠোর ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংশয় কাটে না।

পরমাণু বোমা নয়, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণও নয়, পরমাণুর নোংরা বোমা দিয়েই অতি সহজে একটা জনবহুল অঞ্চলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতিও না করে জনজীবনকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে তোলা যায়। তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দেবার এই বোমা ছোটো-বড়ো সব আকারেই হতে পারে। তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম (cesium) আর দু'চারটে ডিনামাইট বা কিছুটা RDX একটা সুটকেসে ভর্তি করে একটা শহরের মাঝখানে নিয়ে যেতে অসুবিধা তেমন নেই। কাছ থেকে অথবা দূর থেকে ওই ডিনামাইট/RDX এ বিস্ফোরণ ঘটালেই তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম কণা চারদিকে ছড়াবে তাতে সাময়িক বিশৃঙ্খলা সামাল দেওয়াই খুব কঠিন হবে। কতটা তেজস্ক্রিয়তা কতদূর অবধি যাবে তা নির্ভর করবে বাতাসের দিক ও গতির উপর। বড়ো মাপের এই বোমা করতে গেলে সুটকেসের বদলে একটা ট্রাকভর্তি তেজস্ক্রিয় পদার্থ — সিজিয়াম, কোবাল্ট যাই হোক— আর বিস্ফোরক ব্যবহার করলেই হলো। প্লুটোনিয়াম কণা গায়ে লাগলেও তেমন কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এক কণা— এক গ্রমের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ হলেও— নিঃশ্বাসের

□□ তেজস্ক্রিয়তা কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ব্রজিলে ১৯৮৭ সালের একটা ঘটনায়। সে সময়ে পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এক পরিত্যক্ত ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্রে পড়ে থাকা লোহালক্কড়ের সঙ্গে একটা অকেজো চিকিৎসাযন্ত্র দুটো লোক সংগ্রহ করে। যন্ত্রের ভিতরে ছিল ১৯ গ্রাম সিজিয়াম ভর্তি একটা টিউব। এক কালোয়ারকে সেটা বেচে দেয় তারা। টিউবটা ফাটালে তার থেকে বেরোয় জ্বলজ্বলে নীল একধরণের গুঁড়ো। কালোয়ার এই আশ্চর্য গুঁড়োটা তার বাড়িতে এনে সকলকে দেখায়। বন্ধুবান্ধবরা খানিকটা করে নিয়েও যায়। কেউ কেউ গায়েও মাখে। অল্প ক'দিনের মধ্যে তারা ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধরা পড়ে অসুস্থতাটা তেজস্ক্রিয়তাজনিত।

সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকলে ধীরে ধীরে চারপাশের নরম কোষগুলোকে নষ্ট করতে করতে ক্যানসার রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ব্রজিলে ১৯৮৭ সালের একটা ঘটনায়। সে সময়ে পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এক পরিত্যক্ত ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্রে পড়ে থাকা লোহালক্কড়ের সঙ্গে একটা অকেজো চিকিৎসাযন্ত্র দুটো লোক সংগ্রহ করে। যন্ত্রের ভিতরে ছিল ১৯ গ্রাম সিজিয়াম ভর্তি একটা টিউব। এক কালোয়ারকে সেটা বেচে দেয় তারা। টিউবটা ফাটালে তার থেকে বেরোয় জ্বলজ্বলে নীল একধরণের গুঁড়ো। কালোয়ার এই আশ্চর্য গুঁড়োটা তার বাড়িতে এনে সকলকে দেখায়। বন্ধুবান্ধবরা খানিকটা করে নিয়েও যায়। কেউ কেউ গায়েও মাখে। অল্প ক'দিনের মধ্যে তারা ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধরা পড়ে অসুস্থতাটা তেজস্ক্রিয়তাজনিত। সরকার থেকে একলাখেরও বেশি লোককে পরীক্ষা করতে হয়। দেখা যায়, আড়াইশো জনের শরীরে তেজস্ক্রিয়তা বেশি এবং দেড়শো জনের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম শরীরের ভিতরেও ঢুকেছে। যাদের এক-তৃতীয়াংশের দেহই তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু চিকিৎসা যাঁরা করবেন তাদেরও তো ঝুঁকি নিয়েই করতে হবে। তাঁরা তাই করেন কিন্তু পাঁচজনার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তায় এতটাই ক্ষতি হয়েছিল যে, তাদের আর বাঁচানো যায় নি। অজান্তেই তারা তেজস্ক্রিয় বিষের শিকার হয়েছিলেন।

অনেকে বলতে পারেন, এক দেশ থেকে অন্য দেশে এমন সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আনবে কি করে। সীমান্তে তো কড়া পাহারা থাকে। কিন্তু সেই সব কড়া পাহারাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মাদক দ্রব্যের বড়ো রকম চোরা চালান তো অব্যাহতই রয়েছে। ৯/১১-র পর এখন আমেরিকার সব বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আসা প্রতিটি যাত্রীকে, সন্দেহভাজন দেশ থেকে এলে তো কথাই নেই, তন্ন তন্ন করে— মায় জামা কাপড় জুতো খুলিয়ে—'সার্চ' করা হয়। মালপত্র এক্স-রে করে দেখা হয়। কিন্তু সব কি? এই সম্পর্কে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। জাকার্তা থেকে একটা কাঠের বাক্স জাহাজে লস এঞ্জেলস্-এ পাঠানো হয় এবং সেটা ঠিকমতোই পৌঁছোয়। এই বাক্সের মধ্যে ছিল হৃতগুণ (Depleted) ইউরেনিয়াম যা থেকে 'ইউরেনিয়াম-২৩৫' (সহজেই বিভাজিত হয় এবং পরমাণু বোমার উপাদান) অংশ প্রায় সবটাই বের করে নেওয়া হয়েছে। ভিতরে সীসার পাতের আস্তরণ দেওয়া একটা খুব পুরু ইস্পাতের নলের ভিতরে পুরে কাঠের বাক্সের মধ্যে ভালো করে প্যাক করে বস্তুটি পাঠানো হয় এবং কোথাও কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করে সাধারণ ভাবেই তা ঠিকমতো গন্তব্যে পৌঁছে যায়। আমেরিকার এক টেলিভিশন কোম্পানি ABC News-এর এক চোখা সাংবাদিকের দুষ্ট বুদ্ধিতেই ঘটনাটি ঘটে। তিনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরমর্শ করেই ওই চালানি বস্তুটিকে বাছেন কারণ বোমায় ব্যবহার্য অতি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ও হৃতগুণ ইউরেনিয়ামে-র এক্স-রে চেহারা ও স্বাক্ষর প্রায় একই। আর জাকার্তা বন্দর বাছাই করেছিলেন কারণ কিছুদিন আগে ২০০২ সালে কাছের বালিতে আল-কায়দা সন্ত্রাসবাদীদের অগ্নিসংযোগে দু'শোর মতো লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন— জাকার্তা সেই দিক থেকে সন্দেহভাজনই থাকার কথা। অর্থাৎ বেপরোয়া এবং ধূর্ত কোনো দলের পক্ষে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় পদার্থও গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে বা অন্য কৌশলে যে কোনো দেশেই চালান করা সম্ভব।

পরমাণু অস্ত্রের গোপন প্রস্তুতি কোন্ কোন্ দেশে চলছে তার খবর আন্তর্জাতিক মহলে রয়েছে। বন্ধ করা গিয়েছে কি? পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের 'জনক' ড. আবদুল কাদির খান তো পরমাণু অস্ত্র প্রযুক্তির পৃথিবী জোড়া বড়ো রকমের একটা ব্যাবসা খুলে প্রচুর অর্থ কামিয়েছেন। সরকারি সহায়তায় চিন থেকে শুরু করে জার্মানি অবধি বহুদেশ থেকে পরমাণু অস্ত্র প্রযুক্তি সংগ্রহ করে তিনি উত্তর কোরিয়া, ইরাক, ইরান, সৌদি আরবে বিক্রি করে পাকিস্তানকে পৃথিবীর বৃহত্তম পরমাণু প্রযুক্তি রফতানিকারকের সম্মান এনে দিয়েছেন। উত্তর কোরিয়া যে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করেছিল তার পিছনে ডা. খানেরও অবদান রয়েছে এমন সন্দেহ বেশ জোরালো। তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেও তাঁর অনুগামী এবং অনুসারী দু'চার জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই তা বলা যায় না। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে হুমকি দিতে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং এমন কথাও প্রকাশ্যে বলেছন যে, প্রয়োজনে এই বোমা তিনি বেসরকারি সংস্থা ('non-state party')-র হাতেও তুলে দিতে পারেন।

পশ্চিমের দেশগুলোয় পরমাণু শক্তির প্রসার গত দু'তিন দশকে ধরে বন্ধ— একমাত্র ফিনল্যান্ডেই একটা নতুন চুল্লি বসানোর কাজ শুরু হয়ছে। এটা ছাড়া মোটা ৩১টি চুল্লি বসানোর তোড়জোড় চলছে— সব ক'টিই উন্নয়নশীল দেশে। এই তালিকায় ৮টি ভারতের ও ৩টি চিনের— এরাই শীর্ষে। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের হাত ধরে পরমাণু অস্ত্র ও সেই সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রাদি ব্যবহারও বেড়ে চলেছে। বিস্তার যত হবে অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা ততই বাড়বে। আন্তর্জাতিক খবরদারি আছে, থাকবেও। কিন্তু তা পর্যাপ্ত কি? এবং তাও শুধুমাত্র পরমাণু অস্ত্র প্রসার রোধেই। কিন্তু সরকারি আওতার বাইরে বেসরকারি, বেআইনি যে সব ক্রিয়াকর্ম গোপনে চলছে তাতে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তির্যক মানসিকতার আতঙ্কবাদীদের কাছে বিপজ্জনক পরমাণুর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। যে কোনো মূল্যে এটা সংগ্রহ করতে তারা ইচ্ছুক। কল্যাণকর পরমাণুর প্রসারের ভিতর দিয়ে পরোক্ষে তাদের সহায়তা করা হচ্ছে না তো?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *পরিকথা*, ডিসেম্বর ২০০৬।

হিরোশিমা নাগাসাকি-র উত্তরাধিকার আর নয়,
আর নয় উন্নয়নের নামে, ভবিষ্যৎ শক্তির নামে
তেজস্ক্রিয়তার বিষবাহী পরমাণু শক্তি।